আমাদের ১৮ হাজার 'ফেলু'দা

অযোগ্যতাই যাদের যোগ্যতা

লিখেছেন **কবির মুনাদ, খোন্দকার তাজউদ্দিন** ও **সাজেদুর রহমান**

জেমস বন্ড নির্ভর গোয়েন্দা কাহিনী অথবা ছবি কিংবা এ দেশের গোয়েন্দা সিরিজ মাসুদ রানা তুমুল জনপ্রিয়। ছবি দেখে বা বই পড়ে গোয়েন্দাদের সম্পর্কে মানুষের ধারণা, তারা চৌকস এবং চলমান বিশ্বকোষ। গোয়েন্দারা যখন কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলতে যায় তখন তারা ঐ মানুষ সম্পর্কে বিভিন্ন ইনফরমেশন বা উপাত্ত সংগ্রহ করেই যায়। ঐ মানুষ যদি দুর্ধর্ষ হয় তাহলে গোয়েন্দা কিংবা গুপ্তচররা সেই প্রস্তুতিও নিয়ে যায়। সিনেমা বা গল্প উপন্যাসে তখন গোয়েন্দাদের সঙ্গে ঐ দুর্ধর্ষ মানুষের লড়াই বেঁধে গেলেও বাস্তবে এমন ঘটনা তেমন ঘটে না। সিনেমায় গোলাগুলির ঘটনা অবধারিত যেখানে বাস্তবে তা ঘটে কদাচিৎ। আবার বাস্তবে গোয়েন্দারা সরাসরি ঐসব অপরাধীদের গ্রেপ্তার নাও করতে পারে যেখানে সিনেমায় অপরাধীরা গ্রেপ্তার হয়। তবে গোয়েন্দাদের প্রধান কাজ অপরাধ সংগঠনের আগে অপরাধীদের সম্পর্কে বিভিন্ন ইনফরমেশন বা উপাত্ত সংগ্রহ করা। অপরাধী গ্রেপ্তারের জন্য বর্তমানে র‍্যাব ও পুলিশ এবং সীমান্তে বিডিআররা কর্মরত আছেন। অবশ্য বড় ধরনের কোনো অপরাধ সংগঠনের আগে খবর না পেলেও গোয়েন্দাদের কাজ হচ্ছে পরবর্তীকালে এ ধরনের অপরাধী বা অপরাধ সংগঠনকারী সংগঠন সম্পর্কে অকাট্য তথ্য সংগ্রহ করে নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালনকারীদের হাতে তুলে দেয়া, যাতে করে ভবিষ্যতে বড় ধরনের কোনো অপরাধ সংগঠিত না হতে পারে।

আমেরিকায় টুইন টাওয়ার ধ্বংসের ঘটনায় সিআইএ এবং আমেরিকান নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের অনেকেই স্বীকার করেছেন এ ধরনের হামলা হতে পারে, এ ব্যাপারে তারা সরকারকে আগাম সতর্ক সংকেত দিয়েছিলেন। ঘটনার পরে অভিযুক্তদের নাম, ছবি, ঠিকানা এবং তাদের জীবনযাপন প্রণালী পত্রিকা ও টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে প্রচারিত হয়। যাদের অভিযুক্ত করা হয় এবং যারা ঘটনার সময় নিহত হয়েছিল তাদের পরিবার বা কেউ কিন্তু প্রশ্ন তোলেননি যে, ঐ ব্যক্তিরা জড়িত ছিলো না। মূল পরিকল্পনাকারী কে, সে লাদেন নাকি সিআইএ বা মোশাদের কেউ এমন বিতর্ক হয়তো থাকতে পারে। হামলায় অংশগ্রহণকারীদের নিয়ে কোনো অভিযোগ বা

এনএসআই দেশের সর্ববৃহৎ গোয়েন্দা সংস্থা ক্ষমতাসীন দলের সহযোগী সংগঠন হিসেবে কাজ করছে। নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে বিরোধী দলের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ছাড়া তেমন কোনো দায়িত্ব পালন করে না। এনএসআই ট্রেনিং স্কুলের মাধ্যমে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাও পর্যাপ্ত নয়। নিয়োগ দেয়া হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়

বিতর্ক ওঠেনি। একই অবস্থা ইংল্যান্ডের বোমা হামলার ক্ষেত্রেও। কিন্তু বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া বড় ধরনের কোনো বোমা হামলার ঘটনায় যাদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যারা জামিন পেয়ে পালিয়ে আছে, সবার গ্রেপ্তার প্রক্রিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ কিংবা বিচার কার্য কী সন্দেহের আদৌ ঊর্ধ্বে? সবাই এক বাক্যে বলবেন, 'না'। এখানেই গোয়েন্দাদের কার্যক্রম এবং গোয়েন্দা ব্যর্থতার প্রশ্নটি প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

গোয়েন্দা সংস্থা

প্রাচীনকালে রাজরাজাদের একান্ত অনুগত 'চর'রা বিশ্বস্ত অনুচর কিংবা দূতের কাজগুলো করতেন। 'গোয়েন্দা' কার্যক্রম সেখান থেকেই এসেছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এ দেশে ব্যবসা করতে আসার পর তাদের বিশ্বস্ত চরদের নিয়োগ করেছিল। ব্রিটিশ আমলেও তাদের অনুগত চররা উপমহাদেশের মানুষদের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন দমিয়ে রাখার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতো। এ দেশের মানুষ পাকিস্তান আমলে সর্বপ্রথম গোয়েন্দা সংস্থার একটা অবয়ব বা রূপরেখা সম্পর্কে ধারণা পেতে শুরু করে। একই সঙ্গে পাকিস্তান আমলেই গোয়েন্দা সংস্থার মারফত বিরোধী দলের আন্দোলন দমানোর কার্যক্রমটা মানুষের চোখে ভালোভাবে ধরা পড়া শুরু করে। '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৬৯-এর গণআন্দোলন, '৭০-এর নির্বাচন, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা যা আইএসআই (ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স) নামে এখন পরিচিত এবং ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (RAW : Research & Analysis wing)-এর কার্যক্রমটাও মানুষ বুঝতে পারে।

স্বাধীনতার পর নিজ দেশের গোয়েন্দা সংস্থা তাদের কার্যক্রম শুরু করে। পাকিস্তান আমলের মতো এ দেশের গোয়েন্দা সংস্থার কার্যক্রম শুরু থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় একই রকম আছে। এই গোয়েন্দাদের মূল কাজ যেন বিরোধী দলের কোন নেতা কী করছে সেটা খুঁজে বের করা। এ কারণে গোয়েন্দাদের কার্যক্রম বা 'ফাইন্ডিংস' ক্ষমতা বদলের সঙ্গে যেন বদলে যায়। পাকিস্তান আমলে তো বটেই, স্বাধীনতা-পরবর্তী কোনো সরকারই এ সংস্থাগুলোকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দেয়নি। বরং ব্যবহার করেছে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে, গড়ে তুলেছে সরকারের তল্পিবাহক হিসেবে।

১৭ আগস্ট সারা দেশে একযোগে বোমা হামলার ঘটনায় দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ব্যর্থতা জাতির সামনে অনেক বড়ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর এ ব্যর্থতা অবশ্য একদিনের তৈরি নয়। গোয়েন্দাদের মূল কাজ যথাসময়ে সঠিক রিপোর্ট পেশ করা, প্রতিরোধ বা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নয়। গোয়েন্দারা জ্যোতিষী নয় যে, কখন কোথায় কী অঘটন ঘটবে তা বলে দিতে পারবে। তবে হামলা বা দুর্ঘটনা ঘটানোর প্রক্রিয়া চলছে- এ প্রসঙ্গে অবশ্যই তথ্য দিতে হবে।

সাম্প্রতিক বোমা হামলার ঘটনায় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ব্যর্থতার পাশাপাশি সরকারের ব্যর্থতার চিত্রও ভয়াবহ। গোয়েন্দারা একেবারে তথ্য দেয়নি এমনও নয়। তাদের দেয়া তথ্য সরকার অস্বীকার করা বা গুরুত্ব না দেয়ার কারণে যে অঘটন ঘটেছে, তাও বলা হচ্ছে জোরেশোরে।

আমাদের দেশে যে কয়টি গোয়েন্দা সংস্থা কাজ করে সেগুলো হলো ডিফেন্স ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স ফোর্স (ডিএফআই), ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স (এনএসআই), স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি), ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি), ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চ (ডিবি), র‍্যাব ইন্টেলিজেন্স (আরআই)। এছাড়া আর্মি চিফের অধীনে রয়েছে ডাইরেক্টরেট মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স (ডিএমআই) এবং আর্মি সিকিউরিটি ইউনিটি (এএসইউ)। আর এসব প্রচলিত গোয়েন্দা সংস্থাগুলো নিয়ন্ত্রণ করে মূলত সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং রাজনীতিবিদরা।

এগুলোর মধ্যে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি জড়িত তিনটি সংস্থা ডিআইএফ (যা পরিচিত ডিজিএফআই নামে), এনএসআই এবং এসবি।

গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর হালচাল

এনএসআই : বাংলাদেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর মধ্যে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই) অন্যতম। পাকিস্তান আমলে এর নাম ছিল সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্ট ব্যুরো। এটি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে। বর্তমানে এর ডিজি ব্রিগেডিয়ার রেজাকুল হায়দার চৌধুরী এর আগে তিনি ডিজিএফআইতে ছিলেন। অনেকদিন ধরেই এই সংস্থার প্রধান হিসেবে সামরিক বাহিনী থেকে ডেপুটেশনে কর্মকর্তা নিয়োগ করা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিচালক পদেও তিন বাহিনী থেকে কর্মকর্তারা প্রায়শই এখানে নিয়োগ পান। বেসামরিক ব্যক্তিরাও কর্মরত আছেন এখানে। এই সংস্থার মাঠ পর্যায়ে কর্মী, লোকবল কিংবা প্রশিক্ষণ নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে অনেক কথা হয়ে থাকে। আধুনিকায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও লোকবল নিয়োগের জন্য অনেকবার অনেক পরিকল্পনা নেয়া হলেও তেমন বাস্তবায়ন হয়নি। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ সংস্থার দীর্ঘ ৩৪ বছরেও নিজস্ব কোনো অর্গানোগ্রাম নেই। চলছে সেই পাকিস্তানি কাঠামোয়। সংস্থার একজন সদস্য জানান, 'অর্গানোগ্রামের রাঙা মুলা বহুদিন থেকেই ঝুলানো আছে। এটা আরো কতদিন ঝুলবে বলা মুশকিল। অর্গানোগ্রাম স্থগিত হওয়ায় সংস্থায় কর্মরত উচ্চশিক্ষিত কর্মকর্তারা দীর্ঘদিন ধরে সহকারী পরিচালক পদে কর্মরত। তাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।'

এনএসআই দেশের সর্ববৃহৎ গোয়েন্দা সংস্থা। জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে সামরিক বাহিনী এবং ক্ষমতাসীন দলের সহযোগী সংগঠন হিসেবে কাজ করছে। নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে বিরোধী দলের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ছাড়া তেমন কোনো দায়িত্ব পালন করে না। এনএসআই ট্রেনিং স্কুলের মাধ্যমে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তাও পর্যাপ্ত নয়। নিয়োগ দেয়া হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়।

গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর লোকবল ও গোয়েন্দাবৃত্তির খরচ

সংস্থার নাম	লোকবল	খরচ
এনএসআই	৫ হাজার	৮ কোটি
ডিএফআই	৩ হাজার	৬ কোটি
এসবি	৪ হাজার	৬ কোটি
সিআইডি	৩ হাজার	৫ কোটি
ডিবি	২ হাজার	৪ কোটি
আরআই	৩৫৫ জন	১ কোটি
এফআই	১ হাজার প্রায়	২ কোটি
	১৮ হাজার ৩৫৫	৩২ কোটি

বি: দ্র: (১) এটা শুধু গোয়েন্দাবৃত্তির খরচ। বেতন-ভাতাসহ অন্যান্য খরচ আরো অনেক বেশি। ১৮ হাজার ৩৫৫ জন গোয়েন্দা সদস্যের প্রত্যেকের গড়ে আবার ৫-৬ জন করে ইনফরমার রয়েছে। এসব ইনফরমারকে ৫ থেকে ২০ হাজার টাকা করে মাসিক ভাতা দেয়া হয় সরকারি কোষাগার থেকে। মোট ইনফরমারের সংখ্যা প্রায় ৯০ হাজার।
(২) এটি একটি মোটামুটি হিসাব। অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য প্রায় এরকম।

সেনাবাহিনী থেকে সৃষ্ট বিধায় সব গোয়েন্দা সংস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। যেহেতু সংস্থার শীর্ষপদ দেয়া হয় রাজনৈতিকভাবে, ডিজি'র চিন্তাধারা থাকে দলীয় স্বার্থ উদ্ধার করার। তাই দলের কাজ করতে করতে দেশের স্বার্থে কোনো কাজ করার সময় আর তাদের থাকে না

অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা বলতে কিছু থাকে না। ফলে সংস্থাটি জাতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারছে না। এ সংস্থায় কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ওয়াচারসহ সারা দেশে ৩ হাজার ২০০-র বেশি সদস্য ছাড়িয়ে আছে। এর মধ্যে প্রধান শহরগুলোয় কার্যকর আছে হাজার দেড়েক সদস্য। একজন মহাপরিচালকের অধীনে ৫ জন পরিচালক থাকে। মহাপরিচালক নিয়োগ দেয়া হয় সেনাবাহিনী থেকে। পরিচালক নিয়োগ হয় নৌ বিমান ও পুলিশ বাহিনী থেকে। বিভিন্ন বাহিনী থেকে নিয়োগ দেয়া হয় বলে একটি অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব কাজ করে। প্রতি বছর এ সংস্থার জন্য মোট বরাদ্দ থাকে ৭-৮ কোটি টাকা। একদিকে, প্রয়োজনের তুলনায় এ টাকা অপ্রতুল অন্যদিকে হয় অনিয়ম ও লুটপাট। শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং রাজনীতিবিদদের যোগসাজশ থাকায় অনেক কিছু করেও তারা পার পেয়ে যায় বলে অভিযোগ রয়েছে।

ডিএফআই : একজন ব্রিগেডিয়ার কিংবা মেজর জেনারেল পদমর্যাদার কর্মকর্তা মহাপরিচালক বা ডিরেক্টর জেনারেল হিসেবে সংস্থাটির প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন। ফলে অনেক সময় সংস্থাটিকে বলা হয় ডিজিএফআই (ডিরেক্টর জেনারেল অব ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স)। তিন বাহিনীর অফিসার ও নন-কমিশনড অফিসাররা কর্মরত থাকেন এখানে। বেসামরিক অনেক কর্মকর্তাও আছেন। বর্তমানে ডিজিএফআই প্রধান মেজর জেনারেল সাদিক হোসেন রুমি।

গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে 'মিনিমাম অগ্রানোগ্রাম', লোকবল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে এই সংস্থায়। সেনাবাহিনীর 'ইন্টারনাল থ্রেট' এবং 'এক্সটারনাল থ্রেট' দেখার কথা থাকলেও বর্তমানে তাদের রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেনাবাহিনী থেকে সৃষ্ট বিধায় সব গোয়েন্দা সংস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। যেহেতু সংস্থার শীর্ষপদ দেয়া হয় রাজনৈতিকভাবে, সে কারণে ডিজি'র চিন্তাধারা থাকে দলীয় স্বার্থ উদ্ধার করার। আর তাই দলের কাজ করতে করতে দেশের স্বার্থে কোনো কাজ করার সময় আর তাদের থাকে না বলে মন্তব্য করেছেন কেউ কেউ।

ডিএফআই-র প্রশিক্ষণ স্কুল রয়েছে, যার নাম স্কুল অব মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স। এ সংস্থায় লোকবল ২-৩ হাজারের মতো। প্রতি বছর এদের পেছনে ব্যয় করা হয় ৫-৬ কোটি টাকা।

ডিএফআই'র ডিজি'র অধীনে পাঁচজন পরিচালক কাজ করে। যুদ্ধকালীন কোনো সৈন্য বিদ্রোহ করলো কিনা, বিদেশী শক্তি দেশীয় সেনাবাহিনীর কোনো ক্ষতিসাধনে লিপ্ত আছে কিনা, এসব বিষয়ে দেখে থাকে ডিএফআই। ডিজির মতো পরিচালক পদে নিয়োগেও রাজনৈতিক বিবেচনা কাজ করে।

এসবি : স্পেশাল ব্রাঞ্চ। বর্তমানে এসবির প্রধান ফররুখ আহমেদ। এসবি মূলত পুলিশ বাহিনীর 'বিশেষ শাখা' বা গোয়েন্দা সংস্থা। এ সংস্থাটি দেশের স্বার্থবিরোধী যে কোনো কার্যক্রম খুঁজে বের করে এবং অপরাধী চিহ্নিত করে রিপোর্ট প্রদান করে। এসবি'র দায়িত্বে থাকে একজন অতিরিক্ত আইজি, তার পরে একজন ডিআইজি, তার নিচে ১০ জন এসএস বা স্পেশাল সুপার। মোট জনবল ৩ থেকে ৪ হাজার।

প্রতি বছর এদের পেছনে ব্যয় হয় ৫ থেকে ৬ কোটি টাকা। অতিরিক্ত আইজি ও ডিআইজি পদ দেয়া হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়। নিরাপত্তার বিশেষ বিষয় দেখার কথা থাকলেও বর্তমানে এরা নানা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছে। পরিণত হয়েছে সরকারের তল্পিবাহক প্রতিষ্ঠানে।

'গোয়েন্দারা ব্যর্থ নয় ব্যর্থ হয়েছে সরকার'

মেজর জেনারেল (অবঃ) এম.এ হালিম (পিএসসি)
সাবেক প্রধান ডিএফআই

সাপ্তাহিক ২০০০ : দেশে বোমাবাজি হচ্ছে, গ্রেনেড হামলা হচ্ছে কিন্তু অপরাধী চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। এর পেছনে কী কারণ বলে মনে করেন?

এমএম হালিম : গোয়েন্দারা চিহ্নিত করছে না এ কথা সত্য নয়। ১৭ আগস্টের বোমা হামলার ব্যাপারে গোয়েন্দারা সরকারকে অবহিত করেছিল। সে অনুযায়ী ১৪, ১৫, ১৬ তারিখ সরকার এলার্ট ছিল যা স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিজেই বলেছেন। এ ক্ষেত্রে গোয়েন্দারা ব্যর্থ হয়নি, ব্যর্থ হয়েছে সরকার। গোয়েন্দারা ক্রিমিনালদের চিহ্নিত করতে পারে না এ কথা সত্য নয়। সরকার আন্তরিক থাকলে এদের অবশ্যই চিহ্নিত করা সম্ভব। যার প্রমাণ ১৭ আগস্টের পরে আপনারা দেখেছেন।

২০০০ : গোয়েন্দারা হামলার পূর্বাভাস দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার মতামত কি?

হালিম : গোয়েন্দাদের কাজ জ্যোতিষীর মতো নয়। হামলা দিনক্ষণ ঠিক করে হয় না। যুক্তরাষ্ট্রে ১১ সেপ্টেম্বরের হামলা এবং লন্ডনের বোমা হামলাও দিনক্ষণ ঠিক করে হয়নি। এ দুটি হামলার আগে গোয়েন্দারা হামলার আশঙ্কা করে রিপোর্ট দিয়েছিল, তবে দিনক্ষণ ঠিক করতে পারেনি। আপনি পত্রিকায় দেখেছেন, আমাদের গোয়েন্দারা জঙ্গি তৎপরতার তথ্য দিয়েছিল কিন্তু দিন বলতে পারেনি। এটা কেউ কখনো বলতে পারে না। তথ্য দিতে ব্যর্থ হচ্ছে এ কথা সত্য নয়।

২০০০ : কাজ করার ক্ষেত্রে গোয়েন্দাদের সীমাবদ্ধতা কি?

হালিম : গোয়েন্দাদের কাজ রিপোর্ট করা, প্রতিরোধ বা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নয়। গোয়েন্দাদের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গেছে। প্রয়োজনীয় জনবল এবং প্রশিক্ষণ নেই। পর্যাপ্ত ইন্সট্রুমেন্ট নেই।

২০০০ : এ ক্ষেত্রে গোয়েন্দাদের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব কতটুকু কাজ করে?

হালিম : সব সরকারের সময়ই গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ওপর রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করে। আমাদের দেশে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কাজ করে সরকারের হয়ে। যার ফলে অনেক সময় নানা সমস্যা দেখা দেয়।

২০০০ : গোয়েন্দা সংস্থার নানা সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার একটি নীতিমালা গ্রহণ করেছিল...

হালিম : শুনেছি সরকার নীতিমালা গ্রহণ করেছে। বিষয়টি সংসদে গেছে। এরপর কী হয়েছে তা জানা যায়নি।

২০০০ : বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বাংলাদেশে তৎপর রয়েছে বলে বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় এসেছে। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

হালিম : হ্যাঁ বিষয়টি সত্য। তারা তাদের দেশীয় স্বার্থ দেখাশুনা করে। এটা সব দেশেই রয়েছে।

২০০০ : আমাদের দেশে যেভাবে গোয়েন্দা সংস্থা পরিচালিত হচ্ছে তাতে কি কোনো ভুল রয়েছে?

হালিম : অতীত থেকে গোয়েন্দা সংস্থা যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে তাতেও ভুল রয়েছে। এগুলো সংশোধন করে সরকারের কাছে যে নীতিমালা পাঠানো হয়েছিল তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি।

সিআইডি : সিআইডি মূলত অপরাধী চিহ্নিতকরণ কাজে নিয়োজিত থাকলেও বর্তমানে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। শীর্ষ পদ বন্টন করা হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়। মূল দায়িত্ব পালন করেন অতিরিক্ত আইজিপি। তারপর একজন ডিআইজি এবং তার নিচে ১০ জন স্পেশাল পুলিশ সুপার কাজ করে। সারা দেশে এদের সংখ্যা ২ থেকে ৩ হাজার। এদের জন্য বরাদ্দ বছরে ৪-৫ কোটি টাকা।

ডিবি : ডিবি বা 'গোয়েন্দা শাখা' মূলত অপরাধী গ্রেপ্তার করার কাজে নিয়োজিত থাকে। মূল দায়িত্ব পালন করেন একজন পুলিশ সুপার। সারা দেশে লোকবল দেড় থেকে দুই হাজার। প্রতি বছর এদের পেছনে ব্যয় করা হয় ৩-৪ কোটি টাকা।

আরআই : বর্তমান সরকারের সময়ে গঠন করা হয়েছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন বা র‍্যাব। সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, বিডিআর ও পুলিশ বাহিনীর সদস্য নিয়ে র‍্যাব গঠিত। একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদমর্যাদার পরিচালকের অধীনে চারজন উপ-পরিচালকসহ র‍্যাবের সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সদস্য ২৫০ জন। ৭টি ব্যাটালিয়নের পরিচালকের অধীনে ১৫ জন করে সদস্য রয়েছে। ১৫ জনের নেতৃত্বে যারা থাকে তারা এসপি, ক্যাপ্টেন অথবা লেফটেন্যান্ট পদমর্যাদার অধিকারী। এদের ৩ মাস পর পর বদলি করা হয়।

এফ আই : বাংলাদেশ রাইফেল (বিডিআর) এর রয়েছে একটি নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থা। এদের সদস্য সংখ্যা প্রায় হাজার খানিক। দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় চোরাচালান এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এরা কাজ করে।

এছাড়া ডিএসবি, জিএফআই নামে দেশে আরো দুটি সহযোগী গোয়েন্দা সংস্থা রয়েছে।

যেভাবে বেড়ে ওঠা

স্বাধীনতার পর গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কার্যক্রম ব্রিটিশ বা পাকিস্তানি আমলের আদলেই চলতে থাকে। ১৯৭৫ সালে এ দেশে প্রথম রাষ্ট্রপতি হত্যার ঘটনা ঘটে। গোয়েন্দা সংস্থার কার্যক্রম কেমন ছিল তখন? কেউ কেউ এখনো বলার চেষ্টা করেন বঙ্গবন্ধুকে নাকি অনেকেই সতর্ক করেছিলেন। সতর্ক করা আর অপরাধীদের দমন করতে কার্যক্রম হাতে নেয়া কী এক? ১৯৮১ সালে আবারও একজন রাষ্ট্রপতি হত্যার ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশের রাজনীতির ক্ষেত্রে সবচাইতে প্রভাবশালী দু'জন মানুষ যারা রাষ্ট্রপতি ছিলেন, তাদের হত্যাকান্ড রোধ করা যায়নি। এ ব্যর্থতা কী গোয়েন্দা সংস্থার ওপর একটুও বর্তায় না?

'সরকারের নীতিনির্ধারকরা উল্টাপাল্টা কথা বলে তদন্ত কাজ ব্যাহত করেন'

আব্দুর রহিম খান
অতিরিক্ত আইজিপি (অবঃ)

সাপ্তাহিক ২০০০ : আপনি পুলিশ বাহিনীর অতিরিক্ত আইজিপি ছিলেন। ১৭ আগস্টের বোমা হামলাকে কীভাবে দেখছেন?

আব্দুর রহিম খান : ১৭ আগস্টের বোমা হামলাকারীরা নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যের রিহার্সেল দিয়েছে। সরকারি মদদে বোমাবাজরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে। তারা অত্যন্ত সুসংহত ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত। একযোগে নজিরবিহীন এ ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছে, তারা ইচ্ছা করলে আরও বড় ধরনের ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

২০০০ : এতো বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল অথচ সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা কোনো পূর্বাভাস দিতে পারলো না। ঘটনা ঘটার পর কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারলো না। এ বিষয়টি আপনি কীভাবে দেখছেন?

রহিম : আমি বিষয়টির সঙ্গে একমত পোষণ করি না। আপনারা সংবাদপত্রের পাতায় দেখেছেন, গোয়েন্দা সংস্থা আগেই পূর্বাভাস দিয়েছিল। কিন্তু সরকার ঘটনার দিন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই। আর স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিজেই বলেছেন, বোমাবাজদের কথা তিনি জানতেন এবং সে অনুযায়ী ১৪, ১৫, ১৬ আগস্ট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ১৭ তারিখ প্রটেকশন তুলে নেয়া হয়েছিল। যে কারণে এ ঘটনা ঘটেছে।

২০০০ : আপনি বলছেন গোয়েন্দা সংস্থা আগেই সতর্ক করেছিল, সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। এর পেছনে কী কারণ রয়েছে বলে মনে করেন?

রহিম : গোয়েন্দা সংস্থা সরকারকে সতর্ক করেছিল তার প্রমাণ সব জাতীয় দৈনিক প্রকাশিত হয়েছে। তথ্য পেয়েও সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই, বিষয়টি সরকারের ইন্টারনাল। অনেক বিষয়ে ইনফরমেশন পেয়েও সরকার তার নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নেয়।

২০০০ : গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চাপ প্রভাব বিস্তার করে। যে কারণে গোয়েন্দারা ব্যর্থ হচ্ছে। এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

রহিম : সব সরকারের সময়েই গোয়েন্দাদের ওপর রাজনৈতিক চাপ থাকে। সরকারি দল গোয়েন্দাদের মূল দায়িত্ব থেকে সরিয়ে বিরোধী দলের কর্মকাণ্ডের ওপর নজরদারিতে নিয়োগ করে। সরকারের নীতিনির্ধারকরা উল্টাপাল্টা কথা বলে তদন্তকাজ ব্যাহত করে দেয়।

২০০০ : দেশে গোয়েন্দাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ রয়েছে কি?

রহিম : উন্নত বিশ্বের তুলনায় অনেক ঘাটতি রয়েছে।

২০০০ : সাধারণ মানুষ মনে করে গোয়েন্দাদের পর্যাপ্ত জনবল রয়েছে। তারপরেও গোয়েন্দারা ব্যর্থ হচ্ছে কেন?

রহিম : আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার আধুনিক সরঞ্জাম সামান্য। জনবল পর্যাপ্ত নয়। সফল না হওয়ার পেছনে নানা কারণ কাজ করে। পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা অনেক ক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত চাপের মুখে দোষী ব্যক্তিকে ছেড়ে দেয়। তদন্তকারী কর্মকর্তার হাতকে অনেক সময় ক্রিপলড করা হয়। অনেক সময় তদন্তকারী কর্মকর্তার হাতেই হ্যান্ডকাফ পরানো হয় (যেমন এএসপি বাতেন)। তদন্তকারী কর্মকর্তার হাতেই তদন্তের মূল কাজ ছেড়ে দেয়া উচিত। তাহলে গোয়েন্দারা ব্যর্থ হবে না।

২০০০ : বোমাবাজি, গ্রেনেড হামলা হচ্ছে অথচ মূল ক্রিমিনালদের খুঁজে বের করা হচ্ছে না। আপনি বিষয়টি কীভাবে দেখছেন?

রহিম : মূল ক্রিমিনালরা সব সময় ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে কাজ করে। তারপরেও থাকে অদৃশ্য শক্তি। ক্রিমিনালদের আইডেন্টিফাই করার জন্য স্পেসিফিক ক্ষমতা দরকার। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ক্ষমতা পর্যাপ্ত নয়। তারা পরিচালিত হয় উপরের রাজনৈতিক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা। তাদের ইচ্ছার বাইরে কোনো কাজ করা অনেক সময়ই সম্ভব হয় না।

২০০০ : গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর যদি ক্ষমতা স্পেসেফিক করা হয় এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত করা হয় তাহলে মূল ক্রিমিনালদের চিহ্নিত করা সম্ভব বলে মনে করেন?

রহিম : আমি বিশ্বাস করি, দেশে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ক্ষমতা স্পেসিফিক করে দিলে, নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দিলে তারা মূল ক্রিমিনালদের চিহ্নিত করতে পারবে।

গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। তাদের কাজের নির্দেশনা সরকারের শীর্ষমহলের ইশারায় হয়ে থাকে।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ভাগিয়ে এনে সরকারি দলে যোগদান করানোটাও গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন দিয়েই করানো হয়েছে। এমনকি জেলে বন্দি নেতাদের সঙ্গে দর কষাকষি, তাদের মুক্তি লাভ এবং সরকারে যোগ দিয়ে মন্ত্রী হওয়াটাও 'পারফেক্ট'ভাবে সম্পন্ন করতো এই গোয়েন্দা সংস্থাই। বিশেষ করে ডিজিএফআই এবং এনএসআই। ১৯৯১ সালের পর থেকে সেটা বদলে গেছে এমন বলা যাবে না। আওয়ামী লীগ আমলে হাসিবুর রহমান স্বপন ও ডা. আলাউদ্দিনকে সরকারে আনা এবং অতিসম্প্রতি কাজী সিরাজের আওয়ামী লীগ থেকে বিএনপিতে আনার পেছনেও গোয়েন্দা সংস্থার বড় ভূমিকা ছিল।

আওয়ামী লীগ আমলে বোমা হামলার ঘটনায় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো প্রথম 'অন্য রকম ধাক্কা' খায়। এরপর তাদের রিপোর্টে 'হরকাতুল জিহাদ' বা জঙ্গির অস্তিত্ব আওয়ামী লীগ আমলে প্রচার করা হলেও আওয়ামী লীগ সরকার বিশাল ভোটব্যাংকের কথা চিন্তা করে জঙ্গি দমনে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। আর বর্তমান সরকার কিছুদিন আগ পর্যন্ত দেশে জঙ্গিদের কোনো অস্তিত্ব নেই বলে দাবি করলেও ১৭ আগস্ট বোমা হামলার ঘটনার পর এখন সেটা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে।

কিন্তু জঙ্গি-অপরাধী চিহ্নিত করার নামে গোয়েন্দাদের মাধ্যমে বাস্তবে যা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হচ্ছে সেটাও আত্মঘাতী। গত বছরের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলা ও শেখ হাসিনাকে হত্যা প্রচেষ্টার ঘটনায় জর্জ মিঞাকে স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করা এবং আরমান, মুকুল ও সুব্রত বাইনকে প্রধান অভিযুক্ত আসামি করার ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক উঠেছে। বেশ কিছু বিষয় যে আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে তা স্পষ্ট। এছাড়া গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে কথা বলে পত্রপত্রিকা যে রিপোর্ট ছাপে, একেক পত্রিকায় সেটা একেক রকম হয় কেন? বড় ধরনের বোমা বা গ্রেনেড হামলা, হত্যাকান্ড বা সাড়া জাগানো নাশকতামূলক ঘটনায় সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে একটি মাত্র প্রেস কনফারেন্স করা যায় না কেন? গোয়েন্দা সংস্থার অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্য তো একটাই হবে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা পড়লে তা বিভিন্ন রকম মনে হবে কেন?

কোটি টাকা দামের প্রশ্ন

বর্তমানে পাকিস্তানে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর ওপর আইএসআইএ'র নিয়ন্ত্রণ চোখে পড়ার মতো। সাবেক সামরিক শাসক জিয়াউল হক ও বর্তমানে পারভেজ মোশাররফের সময় গোয়েন্দাদের এ নিয়ন্ত্রণটা 'কমন'। ১৯৭১ সালের আগেও এ দেশে মূল গোয়েন্দা দলটির নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে বেশি ছিল ধর্মপ্রিয় দলগুলোর ওপরই। ১৯৭৫-এর পর সেটি আবার নতুন করে শুরু হয় মূলত ধর্মাশ্রয়ী দলগুলো রাজনীতিতে ফিরে আসায়। অনেকেই বলে থাকেন, এ দেশে আন্ডারগ্রাউন্ড বাম দলগুলোর মধ্যে কয়েকটি, বিশেষ করে জনযুদ্ধের ওপর গোয়েন্দা সংস্থার প্রভাব খুব বেশি। জনযুদ্ধের প্রধানতম ক্যাডার যে কি না জামায়াতে ইসলামীর এক সাংসদের বাসায় পালিয়ে থাকে, তাকে ধরেও কিন্তু ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। অথচ মোফাখ্খের চৌধুরীর মতো বয়স্ক মানুষকে খুঁজে বের করার পরই ক্রসফায়ারের আওতায় এনে মেরে ফেলা হয়।

ইদানীং যে প্রশ্নটা উঠেছে সেটি হচ্ছে ড. আসাদুল্লাহ গালিব, শায়ক আব্দুর রহমান এবং সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাইয়ের সঙ্গে মূল দুটো গোয়েন্দা সংস্থার সম্পর্ক কেমন? বাংলা ভাইকে কিন্তু তার এলাকায় তাণ্ডব চালাতে দেয়া হয়েছিল সরকারি উদ্যোগেই, সংবাদপত্রের একাধিক প্রতিবেদনে তা প্রকাশিত হয়েছে। অথচ তাকে পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল। সুতরাং প্রশ্ন উঠতেই পারে বাংলা ভাই যাদের স্বজন সেই শায়খ আব্দুর রহমান, মুফতি হান্নান কিংবা ড. গালিবের সঙ্গে কী গোয়েন্দা সংস্থা বা প্রশাসনের কারো যোগাযোগ ছিল? থাকলে সেটা কোন পর্যায়ের? দেশের স্বার্থেই গোয়েন্দাদের 'আষাঢ়ে গল্প' বন্ধ করা উচিত। জর্জ মিঞাকে

কেসস্টাডি চাঁদপুর: গোয়েন্দাদের হাল

চাঁদপুরে সরকারের ৫টি গোয়েন্দা সংস্থায়ই রয়েছে লোকবল সঙ্কট। নিজস্ব অফিস নেই একটিরও। টেলিফোন, যানবাহন, ওয়াকিটকি সেট নেই অধিকাংশ সদস্যের। এ অবস্থায় চাঁদপুরে গোয়েন্দাদের পক্ষে সাধারণ কোনো ঘটনার আগাম সংবাদ সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়।

চাঁদপুরে ডিএফআইয়ের নিজস্ব কোনো অফিস না থাকায় কুমিল্লা থেকে একজন সিনিয়র সাব-ইন্সপেক্টর মর্যাদার কর্মকর্তা মাঝে মধ্যে জেলায় যান। দু'একদিন থাকেন। অবস্থান করার বেশিরভাগ সময়ই বিভাগীয় বিভিন্ন তদন্তে সময় ব্যয় করতে হয়। ফলে তার পক্ষে গোয়েন্দা তৎপরতা চালানো হয়ে ওঠে না। মাঝে মাঝে একজন সিপাহি পদমর্যাদার সদস্য এসে তার কাজগুলো করে যান। জেলায় স্থায়ীভাবে না থাকায় অদক্ষ কর্মী দিয়ে কাজ করায় অধিকাংশ সময় অতিরঞ্জিত বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।

এনএসআই-এর চাঁদপুরে অফিস আছে। এখানে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা মাত্র ৫ জন। সহকারী পরিচালকের জেলা পর্যায়ে এই বিভাগের কার্যক্রম তদারকি করার কথা থাকলেও এই পদে কর্মকর্তা নেই ৪ বছর ধরে। তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন একজন উপ-সহকারী পরিচালক। মাত্র দু'জন মাঠ-কর্মকর্তা ও একজন ওয়াচার রয়েছে। তারা বাইরে থাকলে অফিস সামলান একমাত্র টাইপিস্ট। জানা গেছে, এ অফিসে কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ১৩ জন। এর মধ্যে ৯টি পদই শূন্য। এদের নিজস্ব কোনো অফিস নেই। শহরের মিশন রোডের একটি দুর্গম গলির ভেতর আবাসিক এলাকায় অফিসটি অবস্থিত। নেই যানবাহনের কোনো ব্যবস্থা। অফিসের সামনে নেই কোনো সাইনবোর্ড। নেই কর্মকর্তা-কর্মচারীদের-বাসভবন ও ব্যারাক। উপজেলাগুলোতে নেই ওয়াচার, ওয়্যারলেস সেট। নেই মেটাল ডিটেক্টরও। তাদের এদিক-সেদিক যেতে হয়। একটি মোটর সাইকেল থাকলেও কেউই তা চালাতে পারে না। ফলে, সেটি পড়েই থাকে।

সিআইডির (ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট) অফিস রয়েছে। তবে নিজস্ব কোনো ভবন নেই। নতুন বাজারস্থ পুলিশ ফাঁড়ির ব্যারাকের ছোট একটি কক্ষে এ বিভাগের কাজ-কর্ম চলে। সামান্য বৃষ্টি হলেই টিনের চালা ও বাঁশের বেড়াঘরের ভেতর পানি ঢোকে। আসবাবপত্র বলতে কিছুই নেই। এখানে একজন ইন্সপেক্টর, ২ জন সাব-ইন্সপেক্টর ও ২ জন কনস্টেবল রয়েছেন। এই বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নিয়ন্ত্রিত হয় কুমিল্লা অফিস থেকে। এদের নেই কোনো যানবাহন, ওয়্যারলেস, টেলিফোন, বাসভবন, ব্যারাক।

ডিএসবি। পুলিশ সুপারের নিয়ন্ত্রণাধীন এই বিভাগের নিজস্ব কোনো অফিস নেই। পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের তিনটি কক্ষই এর কার্যালয়। এখানে একজন ইন্সপেক্টর, ৩ জন সাব-ইন্সপেক্টর, ২ জন সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর ও ১২ জন ওয়াচার পদ থাকলেও একজন সাব-ইন্সপেক্টর ও ২জন সহকারী সাব- ইন্সপেক্টরের পদ খালি আছে। একমাত্র পরিদর্শক ওয়্যারলেস ও টেলিফোন সুবিধা পেয়ে থাকেন। এদের কাছে অবশ্য বেশ কয়েকটি হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর আছে। কিন্তু বিস্ফোরক দ্রব্য চিহ্নিতকরণের কোনো যন্ত্রপাতি নেই। এদের কোনো কোয়ার্টার বা ব্যারাকও নেই।

ডিবি পুলিশের শাখায় একজন ইন্সপেক্টর, ৫ জন সাব-ইন্সপেক্টর, ২জন সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর ও ১৫ জন কনস্টেবল থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে ১ জন এসআই, ১ জন সহকারী এসআই ও ৬ জন কনস্টেবল কর্মরত আছেন। এদেরও কোনো যানবাহন নেই। হাজতখানা নেই, কোয়ার্টার নেই, ব্যারাক নেই। শুধু চাঁদপুর নয় সকল জেলাই একই অবস্থা।

নিয়ে গোয়েন্দা সংস্থা যে কাজ করেছে, বোমা হামলার ঘটনাকে আড়াল করার জন্য মাওলানা মাসউদ কিংবা প্রেসিডেন্ট জিয়া হত্যা মামলায় অভিযুক্ত মেজর মঈন কিংবা মোজাফফরকে দিয়ে সেই একই কাজ করানোর পাঁয়তারা চলছে না তো?

কল্পনার গোয়েন্দা আর বাস্তবের গোয়েন্দা

কল্পনার গোয়েন্দা আর বাস্তবের গোয়েন্দাদের মাঝে রয়েছে আকাশ-পাতাল তফাৎ। বিশেষ করে বাংলাদেশে। অবকাঠামো নেই, পেশাদারিত্বের চর্চা নেই, নেই লজিস্টিক সাপোর্ট। অধিকাংশ জেলায় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর নিজস্ব অফিস, ব্যারাক, বাসভবন নেই। গোয়েন্দাদের যানবাহন, ওয়ারলেস সেট, টেলিফোন, বিস্ফোরক পরীক্ষা করার যন্ত্রেরও অভাব আছে। এখানেই শেষ নয়। বিভিন্ন জেলায় গোয়েন্দা অফিস থাকলেও দেখা যায় গোয়েন্দা কর্মকর্তার পদ শূন্য। যেটুকু আছে তাও রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যবহার না করে দলীয় কাজে লাগানো হয়। এছাড়া গোয়েন্দা সংস্থা-গুলোর মধ্যে রয়েছে সমন্বয়ের ব্যাপক অভাব। সেকেলে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, অবৈধ আয়ের হাতছানি, অন্তর্কলহ ইত্যাদি কারণে দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কার্যত অথর্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এমন দুর্বল গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষে দেশের সত্যিকারের হালহকি-কত কোনোভাবেই তুলে আনা সম্ভব নয়।

'ফেলুদা'রা কি আসলেও ব্যর্থ

সত্যজিতের ফেলুদা সব বিষয়ে নাকি ফেইল করতেন। প্রথম হতেন শুধু গোয়েন্দাগিরিতে। আমাদের 'ফেলু'দা গোয়েন্দররা কী সেই বিষয়েও ফেইলর? অনেকের মতে সেটাই সত্যি। কিভাবে? এর একাধিক জবাব রয়েছে। বাংলাদেশে এতোগুলো গোয়েন্দা সংস্থা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোয়েন্দা নিয়োগ করা হয় রাজনৈতিক বিবেচনায়। মেধা ও দক্ষতা যাচাই করা হয় না। নিয়োগে ঘুষ ও দুর্নীতি 'ওপেন সিক্রেট'। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশপ্রেম ও সততা থাকে না। সামরিক-বেসামরিক আমলা এবং রাজনীতিবিদরাও শক্তিশালী এবং দক্ষ গোয়েন্দা সংস্থা চায় না। দুর্বল গোয়েন্দা সংস্থা মানেই দুর্নীতির আখড়া।

তাছাড়া আমাদের কোনো গোয়েন্দা সংস্থাকে কখনো ইন্টারপোল বা কার্যকরী ইনফরমেশন ব্যাংক হিসেবে গড়ে তোলা হয়নি। এদের দিয়ে রাজনীতি করানো হয়েছে। সুতরাং আধুনিকায়ন দরকার। ডিজিএফআই রাজনৈতিক দলের নেতা ও ডিসি-এসপিসহ বিভিন্ন সরকারি কর্মকর্তা সম্পর্কে নাকি রিপোর্ট দিয়ে থাকে। সারা

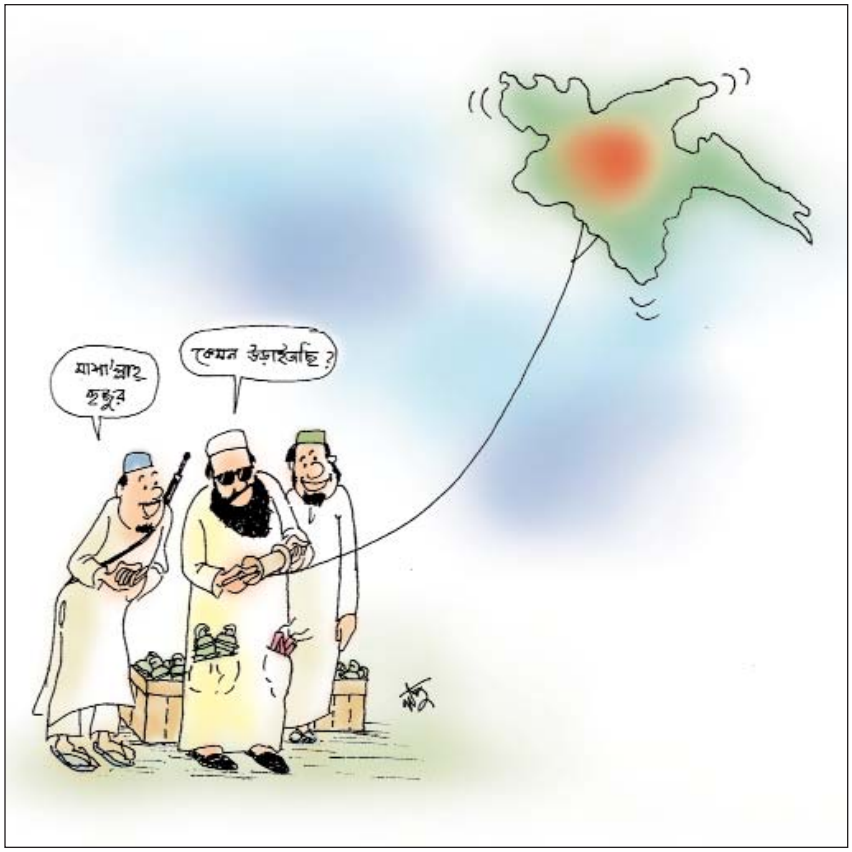

সাম্প্রতিক বোমা হামলার ঘটনায় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ব্যর্থতার পাশাপাশি সরকারের ব্যর্থতার চিত্রও ভয়াবহ। গোয়েন্দারা একেবারে তথ্য দেয়নি এমনও নয়। তাদের দেয়া তথ্য সরকার অস্বীকার করা বা গুরুত্ব না দেয়ার কারণে যে অঘটন ঘটেছে, তাও বলা হচ্ছে জোরেশোরে।

দেশের অপরাধীদের নাম-ঠিকানা, ছবি ও জীবনধারা সংগ্রহ করে সেটির তালিকা আধুনিকায়ন করে তৈরি রাখতে ডিজিএফআই, এনএসআই, এসবি একসঙ্গে কাজ করতে পারে না কেন? এ তালিকা কী র‍্যাব, পুলিশ ও বিডিআরকে সরবরাহ করা যায় না?

জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় যখন জড়িত, তখন এ দেশে অবস্থানরত বিদেশীদের এবং নিয়মিত বিদেশ গমনকারী লোকজনের ওপর সঠিক নজরদারি না করে রাজনৈতিক স্বার্থে লোক হয়রানি করার কোনো সুফলতো আসেনি কখনো। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এনজিও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। বিদেশী টাকা কোনো কোনো বেসরকারি সংগঠন কিভাবে পাচ্ছে, কি খাতে খরচ করছে ও কারা কারা খরচ করছে, সেটি ঠিকমতো দেখভাল করার নামে চাঁদাবাজি করা কী গোয়েন্দাদের কাজ?

কেউ কেউ বলেন, বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের মতো গোয়েন্দা সংস্থাকেও স্বাধীন এবং পৃথকভাবে কাজ করতে দেয়া উচিত। পাল্টা যুক্তি হলো, সেই দক্ষতা ও যোগ্যতা এদের গড়ে উঠেছে কি না। এজন্য অবশ্য র‍্যাবের আদলে গোয়েন্দা সংস্থাকে আধুনিক, প্রশিক্ষিত করে তুলতে এবং লোকবল বাড়াতে বাজেটে আরো বেশি বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করা যায় ।

আসলে এরকম অনেক পরামর্শই দেয়া হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। জাতীয় নিরাপত্তার যে অবস্থা তাতে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে 'পচনশীল' রোগ থেকে সারিয়ে তোলার সময় এখনই।

দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলো শক্তিশালী করা উচিত, যাতে 'র', আইএসআই, সিআইএ-সহ বিদেশী বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার যে কোনো ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম ধরতে পারে। দেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৫০ হাজার লোক এই গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সঙ্গে জড়িত। পেশাগত দক্ষতা না বাড়ালে এরা অথর্ব সংস্থাই রয়ে যাবে।